বিশ শতকের ছয় - এর দশকের নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় বাংলা কিমিতিবাদী নাটকের প্রবক্তা

অনিরুদ্ধ বিশ্বাস

বাংলা সাহিত্যে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় তিনি আগে কবি পরে নাট্যকার। যদিও আমরা এই নিবন্ধে নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কথা আলোচনা করবো, তা-ও আবার ছয় - এর দশকের নিরিখে। বিশ শতকের ছয় - এর দশকে অনেক নাট্যকার নাট্য সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা নাট্য - সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। যাঁরা নাট্য - রচনা করেছেন তারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কিন্তু মোহিত চট্টোপাধ্যায় বুঝি একটু বেশি মাত্রায় স্বতন্ত্র। কেননা বাংলা 'কিমিতিবাদী' বা 'অ্যাবসার্ড' নাটক মোহিত চট্টোপাধ্যায়ই প্রথম শুরু করেছিলেন। বাংলা নাটকের এই নতুন 'ফর্ম' ছয় -এর দশকে খুব সাড়া ফেলেছিল। তাই বাংলা নাট্য - সাহিত্য এই বিশেষ ফর্মের নাটকের জন্য কিন্তু মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ঋণী।

'কণ্ঠনালীতে সূর্য' (১৯৬৩) নাটকটি দিয়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায় বাংলায় অ্যাবসার্ড নাটকের ধারার সূত্রপাত ঘটান। নাটকটি নাট্যকারের অন্যতম একটি শক্তিশালী নাটক। এই নাটকটির বুনট মূলত একটি পৌরাণিক কাহিনীকে মাথায় রেখে। নাটকটির নাম থেকেই সেই পুরাণ - অনুষঙ্গের কথা আমাদের মনে পড়ে যায়। অর্থাৎ রাহুর সূর্যকে গ্রাস করে ফেলার গল্পটি। নাটকটির ভাবনাটিও বেশ উদ্ভট, অদ্ভুত। একজন মানুষ যাকে নাটকে 'লোকটি' বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তিনি নাকি সূর্যকে গিলে ফেলেছেন এবং সেই সূর্য তার গলাতেই আটকে আছে। কিছুতেই তা বেরোচ্ছেনা, লোকটি কাশি দিলে তার গলা থেকে অজস্র পিংপং বল বেরোয়, এই ভাবে গল্পের সূচনা। সমুদ্র মন্থনের সময় দেবতা ও অসুরের তীব্র সংঘাত, রাহুর সূর্য গিলে ফেলা এবং ফলশ্রুতিতে তার গলা কাটা যাওয়া, এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে দেবতাও অসুরের চিরকালের দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীতে সুবিধা ও সংগতি সম্পন্ন মানুষদের সঙ্গে বঞ্চিত, অসহায় মানুষদের মধ্যে যে অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষণের সম্পর্ক ক্রমশ বেড়ে চলেছে - এ নাটকে তা খুব সূক্ষ্মভাবে দেখানো হয়েছে। বঞ্চিত ও শোষিত মানুষেরা দেবতাদের আত্মীয় নয় তারা যে রাহুরই মতো মারাত্মক শক্তিশালী সূর্যকে গিলে ফেলেছে এবং ঘটনাক্রমে অপেক্ষা করছে কখন তাদের গলা কেটে নিতে বা সূর্যকে বের করে নিতে দেবতাদের মতো সুযোগ সন্ধানী ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিশালী মানুষেরা আসবে। পুরাণ থেকে এ নাটক এতটুকুই নিয়েছে। বাকীতে নাট্যকার তাঁর সমকালের যুগযন্ত্রনাকে ধরেছেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধে 'পৃথিবীর গভীরতর অসুখ' -এর ফলে মানুষ হয়ে উঠেছে মানবেতর, হতাশাগ্রস্ত -এ সবই নাটকে স্থান পেয়েছে। তার প্রমাণ আমরা পাই 'লোকটি'র চরিত্রের মধ্যে। সে নিজেকে কুকুর ভাবতে শুরু করে। নাটকের কিছু অংশ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে-

''লোকটি ।। কুকুর ডাকল কোথায়? (ভয়ে ভয়ে ঘরটা খুঁজল) একটা কুকুর ডাকতে
শুনলাম! (আয়নাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের চোখ মুখ দেখতে
দেখতে কুকুরের মত ডেকে উঠল। বুঝতে পেরে হাসল)
লোকটি ।। অদ্ভুত, নিজেকেই খুঁজছিলাম। আত্মানুসন্ধান নয়তো! লাস্টলি এ ডগ্
রিয়ালাইজড্ - আত্মাং বিদ্ধি! দেন আই অ্যামএ গ্রেট
মেটাফিজিকাল ডগ্ আই অ্যাম টু প্রিচ ডগস্ ফিলসফি। কুকুরের দর্শন
প্রচার করতে হবে, লোভের দর্শন, উপেক্ষার দর্শন, ক্ষোভের দর্শন।"

কুকুরে পরিণত হওয়া 'লোকটিকে মিলুরা কুকুর ধরে নিয়ে যেতে আসা লোকেদের হাত থেকে যত বাঁচাবার চেষ্টা করছে এবং লোকটিকে চুপ করে থাকতে বলছে লোকটি ততই 'ঘেউ ঘেউ' করে ডেকে উঠছে।

''মিলু।। চুপ, কাশবেন না। প্লিজ।
লোকটি।। কিন্তু কাশি পাচ্ছে। এক্ষুনি বল পড়তে শুরু করবে।
মিলু।। একটু কষ্ট করে কাশিটা চেপে রাখুন। ওরা বোধহয় আসছে।
(লোকটি দু'হাতে মুখ ঢেকে থাকল শক্ত করে। হঠাৎ হাতটা সরিয়ে ঘেউ ঘেউ করে একবার ডেকে উঠল।)
লোকটা ।। কি কব ভিতর ঠেলে আসছে। বুঝলেন, আপনি অনেক
করলেন, কিন্তু...আই এ্যাম নাথিং বাট এ স্ট্রিট ডগ।"

লোকটির এই কুকুরের মতো আচরণের পিছনে আছে পৃথিবীর শ্রেণী শোষণের দীর্ঘ ইতিহাস। যাইহোক, লোকটি কণ্ঠনালীতে সূর্যকে তার মৌলিক অসুখ বলে দাবি করে এবং কণ্ঠনালীতে সূর্য থাকার দরুণ লোকটি সারা নাটক জুড়েই অস্বস্তি বোধ করে। এই অস্বস্তি আধুনিক মানুষের অস্বস্তি। তবে নাট্যকার এখানে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট করেছেন তা হ'ল মানুষ প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু চারপাশের সামাজিক প্রবণতা ও নিয়ন্ত্রণ তাকে পশুর মতো অসহায় করে তোলে।

যাইহোক, পশ্চিমী অ্যাবসার্ড নাট্যের অনেক উপাদানই এ নাটকে বিদ্যমান। যেমন, মানুষের জীবন ক্রমশ উদ্দেশ্য বিহীন হয়ে যাওয়ার অনুভব, জীবনের বিমূঢ়, বিভ্রান্ত অবস্থা। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তথা নাস্তিকতা, স্বাভাবিক বর্ণনার পরিসরে অসম্ভবের উন্মোচন এবং এ ছাড়াও মাঝে মাঝে কাব্যধর্মী সংলাপ (এ বিষয়ে বোধহয় বলা

যায় নাট্যকার তাঁর কবি স্বভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি), পরিহাস, কৌতুক ইত্যাদি উপাদানগুলি রয়েছে - যা - 'অদ্ভুত' নাটকে প্রায়ই দেখা যায়।

'সমীর' চরিত্রটিও অদ্ভুত নাটকের ছাঁচে তৈরী। সে যে কবিতা লেখা তার পোষা কুকুর 'টমি' -কে নিয়ে তা তো উদ্ভট। কবিতাটিতে একটিই শব্দ প্রতিটি পংক্তিতে সে বারবার লিখেছে। যেমন-

''টমি টমি টমি
টমি টমি টমি
টমি টমি টমি
.....
.....

'নীল রঙের ঘোড়া' (১৯৬৪) নাটকটিতেও অ্যাবসার্ড নাটকের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নাটকটিতে একজন 'প্রৌঢ়' চরিত্র আছে তিনি নাটকের একদম শুরুতে বলেন-

''প্রৌঢ় ।। আমার বক্তব্য হল, আমরা হাসি কেন?

সুহাস ।। আমরা না হেসেও পারি।

(সকলে স্ট্যাচুর মত নিঃশব্দ এবং স্থির হল)

প্রৌঢ়।। তাহলে আমার বক্তব্য বিষয় হল, আমরা হাসি না কেন? ''

এই বক্তব্যের মধ্যে সত্যিকারের কোনো অর্থ নেই, অথচ আকর্ষণীয়। ভারি অদ্ভুত ধরনের বক্তব্য। তবে নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছে সোমনাথ। সে একজন অস্বচ্ছল পরিবারের পিতা; অভিভাবক। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যের সময় সে বাড়িতে এসে বলে সে শনিবারে রেস খেলতে যাবে। তার স্ত্রী মৃন্ময়ী তাতে প্রবল আপত্তি করে। তা সত্ত্বেও সোমনাথকে ঠেকানো যায়না সে যুক্তি দেয় যে, সে রেসের রেজাল্ট আগে থেকেই জানে এবং সেই জিতবে। সত্যি - সত্যিই সে রেস জেতে। কিন্তু সোমনাথ আগাম জেতার খবর কি করে পায়? তার উত্তরে সে জানায় যে একটি বাচ্চাছেলে তাকে একটি কাগজে খবর এনে দেয়। একটা অদ্ভুত জগতে বাস করে সোমনাথ। রেস জেতার পর সে জানায় যে তার আর খেলতে ভালো লাগেনা। কেননা সে আগে থেকে সব জেনে যায়, তাতে কোনো আনন্দ নেই। জেতার পর সোমনাথ যখন ট্যাক্সিতে আসছিল তখন তার এরকম ভাবন্তর হয়। সে সেই কথাই মিনুকে জানায়।

''আমি যখন ট্যাক্সি করে আসছিলাম, প্রথমে বেশ লাগছিল। তারপর বুঝলি মিনু, পথের দুপাশ, ঘর - বাড়ি, গাছপালা, মানুষ, শব্দ, হৈ চৈ সব কেমন ভৌতিক লাগছিল, যেন প্রচণ্ড প্রয়োজনের নেশায় সবকিছুর আত্মা বিক্রী হয়ে গেছে। যেমন সব্বাই আমরা চাবি দেওয়া পুতুল। যেন কেউ একটা প্রকাণ্ড বেলুন ফোলাচ্ছে আর তার গায়ে আমরা আঁকা, ছাপ দেওয়া। ভয়ে আমি চোখ বুজে ছিলাম - যে কোনও মূহূর্তে ফেটে যেতে পারি।''

এই সংলাপ থেকেই স্পষ্ট যে, নাটকে অ্যাবসার্ডধর্মিতা আছে। নাটকের - শেষে আছে আরো আকর্ষণ। নাটকের প্রথম দৃশ্যের যে চরিত্রগুলি প্রৌঢ়, সুহাস প্রমুখ - সবাই হাজির হয় শেষ দৃশ্যে এবং তারা প্লানচেট করে সোমনাথের আত্মা আনার চেষ্টা করে। এক সময় প্রৌঢ়ের শরীরে সোমনাথের আত্মা ভর করে। এদিকে জীবিত সোমনাথ এসে হাজির হয় তাদের মধ্যে। তারা সোমনাথকে দেখে বলে, তার শুধু শরীরটাই আছে। আত্মা তার দেহ ছেড়েছে বেশ কিছু কাল। এক সময় সোমনাথও উপলব্ধি করে তার রেস জেতা নীল রঙের ঘোড়াটিকে নিয়ে তার আত্মা পালিয়ে যায়। সে সেই ঘোড়ার পেছনে ছোটে। নেপথ্য থেকে সোমনাথের আর্ত গলা শোনা যায়—

''মাই ব্লু হর্স, এ হর্স, এ হর্স, এই হর্স, মাই কিঙড্‌ম ফর এ ''হর্স''।''

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের দেহ ও আত্মা - আর একক সত্তা নেই, দ্বিবিধ সত্ত্বায় পরিণত হয়েছে। মানুষের আত্মা মরে ক্রমে পরিণত হচ্ছে যন্ত্রে কিম্বা বস্তুতে। জীবনে অনেক ঐশ্বর্যের মধ্যে দিয়ে কাটালেও শেষ সেই শূন্য পরিনাম। এই ভাবনাই প্রতিফলিত নাটকে।

ছয় - এর দশকে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের রচিত নাটকগুলির তালিকা এবার একটু জেনে নেওয়া যেতে পারে, 'মৃত্যুসংবাদ' (১৯৬৫), 'গল্প রাজের হাততালি', চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড', 'দ্বীপের রাজা' (১৯৬৬), 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' (১৯৬৭), নসাদ (১৯৬৮) 'বাঘবন্দী' (১৯৬৬), 'ক্যাপ্টেন হুরবা' (১৯৭০) প্রভৃতি। সীমিত পরিসরের কারণে উক্ত নাটক গুলির মধ্যে 'মৃত্যুসংবাদ' নাটকটি আলোচনা করে এই প্রবন্ধের যবনিকা টানবো।

প্রথমেই আসি 'মৃত্যুসংবাদ (১৯৬৫), নাটকটির আলোচনায়। এই নাটকটিতে আইরিশ নাট্যকার জন মিলিংটন সিং - এর লেখা 'দি প্লে বয় অফ দি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড (১৯০৭) নাটকের কিছুটা প্রভাব আছে। এই নাটকটি সম্পর্কে মোহিত চট্টোপাধ্যায় একজায়গায় বলেন-

''বিষয় ও বিন্যাসের দিক থেকে মৃত্যুসংবাদ সমকালে কিছু অভিনবত্ব হয়তো দাবী করে। আপাত - অবিশ্বাস্য ঘটনাক্রমের মধ্যে দিয়ে 'লস্টনেস' অস্তিত্বের অর্থ ও অর্থহীনতা, ভালোবাসা আত্মার অভাব পিপাসা, বাঁচার উল্লাস ও -বেদনা, হত্যা ও আত্মহত্যার কারণ ইত্যাদি বিভিন্ন বুদ্ধিগত এবং অনুভব প্রধান জিজ্ঞাসা তার নাম নেই, পরিচিত জীবনের মানুষের কাছে তাই সে আগন্তুক, আউটসাইডার, তার কথা বেদনা উল্লাস যন্ত্রণা আনন্দ তাই গতানুগতিক মানুষের কখনো কৌতুহলের, কখনো বিপজ্জনক, কখনো রহস্যময়। লোকটি আমাদের অবচেতন অঞ্চলের অন্ধকার থেকে শুন্যতা, অর্থহীনতা এবং অনর্থক অস্তিত্বের কাঁটায় রক্তাক্ত হয়ে বাইরে এসেছে। তার কামনা থেকে সুন্দর, ভালোবাসা এবং বাঁচার আনন্দ হারিয়ে যায়নি। সে বাঁচতে চায়, আর এই চরিত্র তার নিজের মতো করে বাঁচতে গেলে আত্মার যে বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত, অন্ধকারের যে উদ্দাম প্রতিবন্ধকতা

তার রূপ নাটকে রয়েছে। পাশাপাশি জীবনের শুভ এবং সুন্দরের সহযোগিতাও বর্তমান। সুন্দরও শূন্যতার মধ্যবর্তী আবর্তভূমিতে

মৃত্যুসংবাদের নায়ক রক্তাক্ত, জীবন পিপাসায় কম্পমান। মানুষের বুদ্ধি, চিন্তা এবং অনুভবের জগতের 'পার্সপেকটিভ' বদলে যাওয়া নিজেরসঙ্গে নিজের, নিজের সঙ্গে পরিজন ও পৃথিবীর, রক্তের সঙ্গে দেহের, দৃষ্টির সহেগ দর্শনের একটি মানসিক অসংযোগ বা নন্‌কমিউনিকেশন উগ্র হয়ে উঠেছে। আর তখন এ - জাতীয় ভাবনার নায়ক নিঃসঙ্গ আউটসাইডার। জীবনের অর্থহীনতা মৃত্যুকে অতর্কিতে প্রয়োজনীয়ভাবে জন্মের পিছনে একটি অকারণ ষড়যন্ত্র কল্পনা করে বিক্ষুব্ধ হয়। আত্মহত্যা মুক্তির মতো লাগে। ঈশ্বর সব পারেন কেবল তাঁর পক্ষে আত্মহত্যা সম্ভব নয় - এক্ষেত্রে মানুষ ঈশ্বরের থেকে নিজেকে বড় মনে করে পুলকিত, কিন্তু আমরা সকলে আত্মহত্যা করি নি। আত্মহত্যার ভৌতিক পরিবেশে বাস করি। এ নাটকে আগন্তুক চরিত্রটি এই ভৌতিক পরিবেশে আকণ্ঠ মজ্জমান হয়েও মুক্তিতে বিশ্বাস হারায় নি।

নাটকটির পটভূমিতে আছে একটি মফস্বল শহর। শুরুতেই দেখা যায় কিছু ছেলে একটা স্পোর্টসের আয়োজন করেছে। তাদের সঙ্গে আছে বুলু নামের একটি প্রাণবন্ত মেয়ে। সামনেই তার বি.এ. পরীক্ষা। সুবোধ নামের এক যুবকের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। সুবোধ খুবই ভীতু নীরেন তাদের অভিভাবক - স্থানীয় প্রতিবেশী, মদখান। যাইহোক, সুবোধ হঠাৎ এসে বুলু ও নীরেনবাবুকে খবর দেন যে সে রেললাইনের ধারে একটা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছে। কথাবার্তায় বোঝা যায় যে লোকটি জীবিত কি মৃত তা সে ভালো ভাবে দেখেনি। এমন সময় এক আগন্তুক এসে ওদের ঘরে ঢোকে। নাটকে সে 'লোকটি' বলে চিহ্নিত। লোকটির হাবভাব অদ্ভুত, কথাবার্তাও তেমনি। লোকটি জানায়, সে তার বাবাকে খুন করে এসেছে। সে ব্যাখ্যা করে বলে–

''লোকটি।। এই পৃথিবীতে আমি না এলেই কত ভালো ছিল। আমার বাবা, মা এরাই তো আমাকে অনর্থক নিয়ে এল। পৃথিবী কি নিষ্ঠুর খেলা খেলেছে আমাদের নিয়ে। আমার বাবাই তো দায়ী। মা থাকলে তাঁকেও দায়ী করতাম। আমি মরে যেতে পারতাম - বাবা আমাকে ঘিরে রেখে রেখে বাঁচিয়ে রেখেছে আরও ভয়াবহ অস্তিত্বের অগ্নিকাণ্ডে আমাকে দিনরাত পোড়াবে বলে। বাবা আমার বাবাই সব অস্বস্তির মূলে। ওই প্রৌঢ় লোকটি স্নেহের ছাতা ধরে আমাকে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে যেতাম এক এক দিন। অসহ্য মুহূর্তে প্রতিদিন মেরে ফেলতে চেয়েছি, পারিনি। শেষ পর্যন্ত পারলুম। আজ আমি মুক্ত, পৃথিবীর নিষ্ঠুরতার শোধ নিয়েছি। বুলু।। পৃথিবীর আর সব খুনীর থেকে কিন্তু আপনি আলাদা। খুনের মধ্যদিয়ে আপনি একটা অর্থ খুঁজতে চেয়েছেন। তাই না?

লোকটি ।। ঠিক বলছেন একটা অর্থ বলেছেন আপনি।''

অর্থনীনতার মধ্যে থেকে অর্থ খোঁজার চেষ্টা করা অ্যাবসার্ড দর্শনের একটি অন্যতম উপাদান বা বৈসিষ্ট্য। বুলুর কথায় তা স্পষ্ট।

লোকটি যে তার বাবাকে হত্যা করে - এই ঘটনাটি সত্য নয়। আসলে সেটি তার ধারনামাত্র। সে বিশ্বাস করে, তার বাবাকে ঘুমন্ত অবস্থায় মাথায় হাতুড়ি মেরে হত্যা করে। কিন্তু পরে তার বাবা ছেলের খোঁজ করতে এসে নীরেনবাবু ও বুলুদের বলেন

''প্রৌঢ় ।।... আমি ওকে জন্ম দিয়েছি তাই ওর সব অস্বস্তির কারণ ভাবতো আমাকে। ও আমাকে মেরে ফেলে মুক্ত হবে - এসব বলত। একদিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, আমার মাথায় নাকি এই রকম একটা কয়লা ভাঙা হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেই ও পালিয়েছে - এই রকম একটা চিঠি আমার দাদার কাছে লিখেছিল নীরেন ।। তাহলে আপনার মাথায় আঘাত করেনি বলছেন।

প্রৌঢ় ।। যথার্থ ধরেছেন, আসলে আঘাত করাটা ওর একটা ধারনা মাত্র। ঘটনার চেয়ে ধারনাটাই ওর কাছে এক এক সময় সত্যি বলে মনে হয়। অদ্ভুত ধরনের ছেলে তো?

এছাড়া একটি সংলাপ লোকটি নীরেনবাবুকে বলে, 'আসলে বাবাকে মেরে ফেলা আর মারতে চাওয়া যে ফিলসফিক্যালি একই ব্যাপার তা ওদের বোঝানো যাবেনা।' এই রকম ধারনার লালন কাম্যুর ভাষায় 'ফিলসফিকাল সুইসাইড' - এর কথা মনেপড়ায়। আসলে পিতাকে হত্যার ধারনার মধ্যে স্রষ্টার হত্যার প্রচেষ্টার কথা, বলা হয়েছে। যে স্রষ্টা অর্থহীন মানবজন্মের কারণ এবং নিজেরও সে অর্থে একটি উল্লেখ যোগ্য বৈশিষ্ট্য - যার সূত্রপাত করেছিলেন নিটজে তাঁর দাস স্পেক জরথুষ্ট (১৮৮৩ - ৯২) বইতে গড় ইজ ডেড বা ঈশ্বরের মৃত্যুর কথা ঘোষনা করে। আর এ নাটকেতো তার প্রতিফলন আছেই। কাজেই 'মৃত্যুসংবাদ' নাটকটি যে উপরোমাত্রায় 'অ্যাবসার্ড' নাটক তা বলাই বাহুল্য।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কটি নাটক আলোচিত হল' এই নিবন্ধে তাতে দেখা গেল যে পৃথিবী ও তার সভ্যতার মূল্যায়ন ও অনুভূতিতে তিনি দেখেছেন শূন্য, অর্থহীনতা ও উদ্দেশ্যহীনতা যা তাঁর 'মৃত্যুসংবাদ' -এ বিশেষ করে দেখা যায় এবং কমবেশি ও নানা বৈচিত্র্যে 'কণ্ঠনালীতে সূর্য', 'নীল রঙের ঘোড়া' প্রভৃতি নাটকেও লক্ষিত হয়। সবমিলিয়ে, নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় বাংলা নাট্য সাহিত্যের এক নবধারার বাহক একথা জোর দিয়েই বলা যায়।